দ্বিশতবর্ষে বাংলা সংবাদপত্র

ঐতিহ্য ও পরম্পরা

সম্পাদনা
স্বপন বসু • অভিজিৎ রায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

DWI-SHATABARSHE BANGLA SAMBADPATRA : OITIJHYA O PARAMPARA
(A Commemorative volume on 125 years of Bangiya Sahitya Parishat)

Edited By

SWAPAN BASU • ABHIJIT ROY

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ISBN : 978-93-84816-88-9

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে (কর্পাস ফান্ড) মুদ্রিত
Published with Financial Assistance (Corpus Fund) from
Ministry of Culture, Govt. of India.
February, 2022

প্রকাশক
পঙ্কজকুমার দত্ত
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
প্রবীর সেন

মুদ্রক
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মূল্য : ৭০০ টাকা

সূচি

ভূমিকা ... এগারো

ক) বাংলা সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব	মুনতাসীর মামুন	...	৩
উনিশ শতকের দৈনিক পত্রিকা	স্বপন বসু	...	২৪
সোমপ্রকাশ	প্রসূন ঘোষ	...	৩৬
বঙ্গবাসী : প্রতিক্রিয়ার রূপ	প্রশান্ত ধর	...	৬৫
হিতবাদী : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	বিদিশা চক্রবর্তী	...	১১৪
বাংলা সংবাদপত্রে 'সংবাদ'-এর ক্রমবিবর্তন : ১৮১৮-১৮৭৮	অঞ্জন বেরা	...	১২৪
অগ্নি যুগের চারটি পত্রিকা—*সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দে মাতরম ও নবশক্তি*	নির্মলকুমার নাগ	...	১৫৩
দৈনিক বসুমতী	প্রবীরকুমার বৈদ্য	...	১৭৮
দৈনিক *আজাদ*	মামুন সিদ্দিকী	...	১৮৮
যুগান্তর : উত্থান-অবদান-সমাপন	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	...	২০২
দৈনিক *স্বাধীনতা*	অনুরাধা রায়	...	২২৩
দৈনিক জনসেবক	অর্ণব নাগ	...	২৫৭
বিশ শতকের আঞ্চলিক পত্রিকা	শেখর ভৌমিক	...	২৮৪

খ) গদ্যশৈলী—অঙ্গসজ্জা

সংবাদপত্রের গদ্য : বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত রূপ-চিত্র	প্রসূন বর্মন	...	৩০৯
সংবাদপত্রে শিল্পকর্ম	প্রণবেশ মাইতি	...	৩২৬
কার্টুন নিয়ে ব্যঙ্গচিত্রীর ভাবনা	অমল চক্রবর্তী	...	৩৩২

গ) সংবাদ-শাসন

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট থেকে জরুরি অবস্থা	পঙ্কজকুমার দত্ত	...	৩৪৭

ঘ) মুদ্রণের বিবর্তন

মুদ্রণ প্রযুক্তির বিবর্তন ও বাংলা সংবাদপত্র	তৃষ্ণা বসাক	...	৩৬৫

দৈনিক বসুমতী

প্রবীরকুমার বৈদ্য

উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ১৮৯৬-এর আগস্টে কলকাতা থেকে *বসুমতী* নামে একটি পত্রিকা বেরোয়। হিন্দুধর্ম ও জাতীয় ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যেই সাপ্তাহিকীটির প্রকাশ। পত্রিকাটির প্রাণপুরুষ ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে অনেক খ্যাত মানুষজন এর সম্পাদনার ভার বহন করেন। প্রথমদিকে ব্যোমকেশ মুস্তফি, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই দায়িত্বে ছিলেন। পরে জলধর সেন, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরিপদ অধিকারী, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এর সম্পাদক হন।

টানা আঠারো বছর পত্রিকাটি চালানোর পর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এসে উপেন্দ্রনাথ একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাব সেই তাগিদকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সেইমতো প্রথমে *বসুমতী টেলিগ্রাম* নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক বের করার ব্যবস্থা করে। এটির আকার খুব বড়ো ছিল না, পৃষ্ঠাসংখ্যাও ছিল কম। দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের যে উদ্দেশ্য তা এই ধরনের পত্রিকা দ্বারা সম্ভব নয় ভেবে উপেন্দ্রনাথ ১৯১৪-র ৬ আগস্ট পাকাপাকিভাবে *দৈনিক বসুমতী* প্রকাশ করেন। এজন্য উপেন্দ্রনাথকে বেশকিছু টাকা ধার করতে হয়।[১]

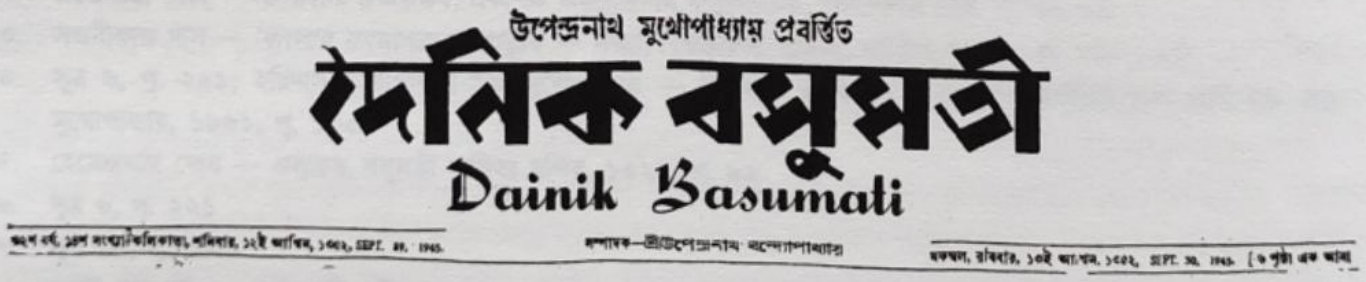

দৈনিক বসুমতী-র প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে।[২] এক পয়সা দামের আকারে বেশ বড়ো *দৈনিক বসুমতী* প্রকাশের পর পরই জনপ্রিয় হয়েছিল।[৩] বিশেষ করে যুদ্ধের খবর দিত *বসুমতী*। শিক্ষিত বাঙালির পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ মানুষও পত্রিকাটি সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানতে পারি,

> —আমি শিশু তখন—দূর গ্রামে গৃহস্থবাড়ির ছেলে। সাপ্তাহিক বসুমতীর বড়ো নাম ডাক। গ্রামবাসী পুরো একটি সপ্তাহের ব্যাকুল আগ্রহ কোনোরকম চেপেচুপে থাকেন, বসুমতী যেদিন আসবে ডাকঘরে ভিড়ের অন্ত থাকে না। কাগজ আসামাত্র হাতে পৌঁছান চাই। পিওনের অপেক্ষায় আরও দেরী করতে কেউ রাজী নন। তারপরে কয়েকটা দিন গ্রামবাসী ইতর-ভদ্র যেন আন্তর্জাতিক মানুষ হয়ে যান, হাটে ঘাটে সর্বত্র বাহিরের জগতের কথা। গ্রামীণ সমস্যা ঘরোয়া কথাবার্তা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে যায় সেই কয়েকটা দিন।
>
> একদিন ঘোষণা হল, বসুমতী দৈনিক রূপ নিয়ে প্রতিদিনের ডাকে আসবে। সপ্তাহকাল অপেক্ষা করতে হবে না দুনিয়ার খবরাখবরের জন্য। কি উত্তেজনা, গ্রামের মানুষের মধ্যে কত উল্লাস।[৪]

যুদ্ধের হুজুগে মেতে থাকা নয়, যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কী সে বিষয়ে জনসাধারণকে যা যা তথ্য পরিবেশন করা যায় তার প্রায় সবটাই করেছে *দৈনিক বসুমতী*। কীভাবে যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, ভস্মীভূত হচ্ছে ঘর-বাড়ি, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে কীভাবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে তার বিবরণ প্রকাশ করত পত্রিকাটি। অন্যদিকে যুদ্ধে ইংল্যান্ডের হয়ে ভারতীয়দের যোগদান, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনীতিতে তার প্রভাব বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠে এসেছে পত্রিকাটির পাতায়—

> It is quite evident that the war will never come to an end until one of the contending parties is thoroughly worn out. The object of the war is to decide which of the European Powers should wield the greatest influence in the world. And as it is not likely that any of the contending Powers will submit to the supremacy of another so long as it has the least amount of strength left to it, the war cannot be expected to be over very soon. If the war really goes on as it is going on at present, it will be necessary to keep a tremendously large number of trained soldiers always ready for action, so that they may at a moment's notice take the places of those who are killed, and the number of the latter is by no means small. Men and money are the two factors which are vitally important in warfare. It will not do to have only a few soldiers, for a war like this requires men by the lakh. These soldiers, again, should not be recruited from only a certain country or from only one particular community, for then the country will be denuded of fighting men, just as was the case after the great Kurukshetra War.[৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ-নীতিকে বহু দেশ মেনে নিতে পারেনি। পত্র-পত্রিকাগুলি তা নিয়ে সরব হয়েছে। *দৈনিক বসুমতী* জার্মানির যুদ্ধ নীতিকে মাহমুদ ও নাদিরশাহের বর্বর যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে লেখে—

> The reported barbarity of the German army is comparable only with the historic barbarity of Mahamud and Nadir Shah, and is attributable only to the Godless civilisation of Europe which gives the highest place of honour to the nation which has the highest capacity for killing.[৬]

দৈনিক বসুমতী মনে করত যে সব দেশে যুদ্ধ হচ্ছে তাদের লোকবল ও অর্থবল কমে যাচ্ছে, বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে, স্ত্রীলোক ও শিশু, বৃদ্ধের উপর অত্যাচার চলছে। ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা দেশবাসীর কল্যাণকর কাজে হাত দিতে ও টাকা খরচ করতে বিলম্ব করে। যুদ্ধ চলছে বলে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতির জন্য টাকা খরচ করার সম্ভাবনা বড়োই কম।

কাঁচা মাল থেকে জিনিসপত্র তৈরি করে ভারতবাসী বিক্রির জন্য বিদেশে খুব বেশি পাঠাতে পারে না, অধিকাংশ জায়গায় কাঁচামালই পাঠাতে হয়। কিন্তু কাঁচামালও আগের মতো রপ্তানি হচ্ছে না। যেমন পাট। পূর্ব ও মধ্য বঙ্গের চাষিরা অনেক জায়গায় ধানের চাষ ছেড়ে পাটের চাষ ধরেছে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য পাটের কাটতিও কমে গিয়েছে। কারও কারও মোটেই বিক্রি নেই, কেউ জলের দরে তা বিক্রি করছে। এভাবে অনেক জেলায় সাধারণ লোকদের মধ্যে যে অন্ন কষ্ট দেখা দিচ্ছে সে কথা জানাতে ভোলেনি *বসুমতী*।

রপ্তানির পাশাপাশি যুদ্ধের জন্য আমদানি ক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। জার্মানি, ইংল্যান্ডের যে সুতো ভারতে আসত তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাপড়ের দাম হু হু করে বেড়েছে। স্বদেশি আন্দোলনের প্রতীক রাখি তৈরির ক্ষেত্রেও সুতোর জোগান মেলা ভার হচ্ছে। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে রাখি উৎসব। কলকাতায় জিনিস পত্রের দাম আগুন। *দৈনিক বসুমতী* লেখে—

> The prices of food-stuffs have gone up so enormously as to require the intervention of the police, and articles such as Horlick's malted milk, barley powder, arrowroot, soap, biscuits, etc. are selling at very high prices. Even potatoes cannot be had for anything under 3 annas 6 pies a seer, though the usual price is 2 annas 3 pies. These high prices, says the paper, may not cause any inconvenience to His Excellency the Govornor but they are inflicting no end hardship on poor folk.[৭]

যুদ্ধের ফলে একটি বিষয়ে আমাদের সুযোগ হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করত। জার্মানি ও অন্যান্য দেশের মালের

আমদানি বন্ধ হওয়ায় বা কমে যাওয়ায় আমরা যদি সেসব জিনিস প্রস্তুত করতে পারি তাহলে অনেকটা অভাব দূর হবে। শিল্পের সম্ভাবনাও তৈরি হবে।[৮]

যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ খবরের পাশাপাশি সমকালীন বিশ্ব ও দেশের নানান রাজনৈতিক ঘটনাবলিতে পূর্ণ থাকত *দৈনিক বসুমতী*। রাশিয়ার জার শাসনের অবসানের বিবরণ যেমন এখানে উঠে এসেছে, তেমনি বুড়িবালামের তীরে চার্লস টেগার্টের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীদের রোমহর্ষক সংঘর্ষের কথাও ঠাঁই পেয়েছে। বিপ্লবীদের করুণ পরিণতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে পত্রিকাটি।

ইংরেজ শাসনের প্রতি আস্থাশীল এই পত্রিকাটি বিপ্লবীদের কথা বললেও কংগ্রেসের কার্যাবলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরতেই বেশি তৎপর ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকারকে সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। সৈন্য ও অর্থ দিয়ে ভারতবাসী নানাভাবে সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সামিল হয়। অনেক ভারতীয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করে। ভারতবাসী আশা করেছিল যে যুদ্ধ শেষে সরকার তাদের স্বায়ত্তশাসন দেবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে স্বায়ত্তশাসনের নামে ভারত শাসন আইন নিয়ে দেশের মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এর মধ্যে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন হয়ে গেলেও স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলন, প্রতিরোধ চলতেই থাকে। পাটনা, লাহোর, বম্বে সহ ভারতের নানা স্থানে সভাসমিতি ও আন্দোলনের স্বরূপকে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরে পত্রিকাটি।[৯]

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য যদুনাথ মজুমদার ১৯২১-এ স্বায়ত্তশাসন লাভ করবার উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব পেশ করেন তা উদ্ধৃত করে *দৈনিক বসুমতী* জানায় ভারতের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি খুব শীঘ্রই নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।[১০] সাপ্তাহিক *নেশন* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধকে অনুসরণ করে পত্রিকাটি বলে ভারতবাসীরা যে শাসনতন্ত্রের দাবি করেছে তা ফলপ্রসূ হলে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কমে যাবে এবং সরকারি কাজে অনেক সুবিধে হবে।[১১]

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করে সরকার চেয়েছিল স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ধামাচাপা দিতে যেখানে প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়।—সংরক্ষিত বিষয় ও হস্তান্তরিত বিষয়। আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, প্রশাসন, অর্থ, বিচার, শ্রম প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল সংরক্ষিত এবং এই বিষয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে। এই মন্ত্রীরা তাঁদের কাজকর্মের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়ী থাকতেন। হস্তান্তরিত বিষয়ে প্রাদেশিক আইনসভা কোনো আইন প্রবর্তন করলে গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল তা নাকচ করে দিতে পারতেন। তবে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শাসনব্যবস্থা যে সরকারের কুক্ষিগতই রয়ে গেল, তা জনগণ অচিরেই বুঝতে পারে। প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নানা প্রদেশে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ উঠে আসে *দৈনিক বসুমতী* তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে।[১২]

দ্বৈত শাসনে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের অবস্থা সম্পর্কে পত্রিকাটি দুঃখপ্রকাশ করে বলে—

> মন্ত্রীদের অবস্থা অবমাননাকর ও আত্মসম্মানহানিকর। রাজস্বের কোনও অংশের উপর তাঁহাদের হাত নাই। সংরক্ষিত বিভাগে ব্যয় করিয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলেও তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সরকারের নীতির উপরও তাঁহাদের কোনো হাত নেই।[১৩]

দ্বৈত শাসন সম্পর্কে সরাসরি অভিযোগ করে পত্রিকাটি লেখে—

> আমরা জানি যে, দ্বৈতশাসন ধ্বংস হইলে গভর্ণমেণ্ট অচল হইবে না, বরং মন্ত্রীমণ্ডল ধ্বংসে শ্বেতাঙ্গদের আরও আনন্দ হইবে, কারণ তাহাদিগকে কাহার নামমাত্র অধীনতা ও কাজ করিতে হইবে না। দ্বৈতশাসন চলিতে পারে না; যে সরকার পার্লামেণ্টের অর্দ্ধেক এবং ব্যবস্থাপক সভার নিকট নামেমাত্র অর্দ্ধেক দায়ী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাট, সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী—এমন কি সরকারী চাপরাসীর নিকট দায়ী উহা চলিতে পারে না।[১৪]

১৯২৯-এ সরকারের একপেশে মানসিকতা থেকে গঠিত হয় সাইমন কমিশন। এই কমিশনে কোনো ভারতীয়কে স্থান দেওয়া হয়নি। এটি ভারতীয় জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি করে। হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় নানা স্থানে। *দৈনিক বসুমতী* জানায় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালী সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার যে কমিশন নিয়োগ করেছে, সেই কমিশনের জন্য ভারতের জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। এই কমিশন সম্পর্কে প্রত্যেক জেলায়

জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করা কর্তব্য। শুধুমাত্র পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে এই কমিশন গঠন করায় ভারতবাসী বুঝেছে যে তারা এখনও সম্পূর্ণ পরাধীন এবং ভারতকে কীভাবে শাসন করা হবে তার নিয়ন্ত্রণের ভার একমাত্র ইংরেজদেরই আছে। পত্রিকাটি এ-ও জানায় যে ইংরেজ আগেই বুঝেছিল যে ভারতবাসী কমিশন নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ করবে। সেজন্য বড়োলাট লর্ড আরউইন ভারতের নেতৃবর্গকে আহ্বান করে সে সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করেছিলেন। নেতৃবর্গ বড়োলাটকে কী বলেছিলেন তা এখনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হলেও এখন তাঁদের ভাব দেখে বোঝা যায় তাঁরা কী বলেছিলেন। লর্ডস সভায় লর্ড বার্কেনহেডের বক্তৃতায় এবং লর্ডস সভায় ও কমন্স মহাসভায় আলোচনার কোনোরকম পরিবর্তন হয়নি। কমিশনের কাজ তাড়াতাড়ি শুরু হবে এবং ইংরেজরা যেভাবে ভারতের ভাগ্য নির্ণয় করবেন, সেভাবেই ভারতকে চলতে হবে। তবে পত্রিকাটি মনে করিয়ে দেয় যে ভারতবাসী একবাক্যে কমিশন বর্জন করেছে। ১৯১৭-এর পর এই প্রথম ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পুনরায় মিলিত হয়েছে। কংগ্রেস দল, স্বরাজ্য দল, লিবারাল দল ও কমিউনিস্টরা সকলেই মিশন বর্জনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দল কমিশন বর্জনের কথা বলেছেন।[১৫] এরপর *দৈনিক বসুমতী* সরাসরি বলেছে—

> কেবল প্রতিবাদ করিলেই কমিশনের কাজ বন্ধ হইবে না। কমিশন যে আসিতেছে, তাহা একেবারে সত্য, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কী? আমাদিগকে এখন মিশরের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। মিশরের জননায়ক জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিলনার কমিশনের যে অবস্থা হইয়াছিল, এই সাইমন কমিশনেরও সেইরূপ অবস্থা করা কর্ত্তব্য। মিশরবাসী ঐ কমিশনকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া মিশরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ইংরাজের অধিকার অস্বীকার করিয়াছিল এবং কমিশনকে এইরূপ ভাবে বর্জ্জন করিয়াছিল যে, ইংরাজ বুঝিয়াছিল যে, মিশরে তাহাদের কর্ত্তৃত্বের অবসান হইয়াছে। ভারত যদি ঠিক সেইরূপ করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতও জয়যুক্ত হইবে।[১৬]

সাইমন কমিশন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গিকেও *দৈনিক বসুমতী* ধারাবাহিকভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে।[১৭] তবে শুধু সাইমন কমিশনের কথাই নয়। ভারতের রাজনীতিতে গান্ধিজির আবির্ভাব থেকে শুরু করে শেষদিন পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনের প্রায় সব খবরাখবর *দৈনিক বসুমতী*-তে স্থান পেয়েছে। সংগঠিতভাবে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেও হিংসাত্মক ঘটনার কারণে অহিংস আন্দোলনের প্রতি অনুগত গান্ধিজি তা বন্ধ করে দেন। এরপর থেকেই জাতীয় কংগ্রেসসহ ভারতবাসীর কাছে গান্ধিজির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই মধ্যে ১৯২৭-এ মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উঠে আসে কংগ্রেসের নতুন সদস্যদের মধ্য থেকে এবং তা পাস হয়ে যায়। গান্ধিজি এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন। তিনি পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী হলেও তাঁর মতে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কছেদের সময় তখনও আসেনি। এ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে চাপান-উতোর চললে গান্ধিজি তাঁর বক্তব্য পেশ করতে থাকেন পত্র-পত্রিকায়। *দৈনিক বসুমতী*ও সেই সংবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকে।[১৮] গান্ধিজির কথায়, তিনি স্বাধীনতা শব্দের অর্থ বোঝেন না, তার জন্য তিনি ব্যাকুল নন, তিনি ইংরেজদের বন্ধন থেকে মুক্তি চান। সেজন্য তিনি সব ধরনের পণ করতে প্রস্তুত। এমনকি মুক্তির জন্য যদি দেশে কিছু দিনের জন্য বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই, কেননা ইংরেজের দেওয়া এই শান্তি-শৃঙ্খলা জাতির পক্ষে শাস্তি। এই শয়তানি শাসনে এই সুন্দর দেশের আর্থিক, নৈতিক ও শারীরিক ধ্বংসসাধন হয়ে চলেছে।[১৯] গান্ধিজি জনসাধারণকে এ-ও মনে করিয়ে দেন যে তাঁর নীতি-পদ্ধতিতে বলপ্রয়োগ নেই—এটা আত্মনিগ্রহ, অত্যাচারীর নিগ্রহ নয়। স্বাধীনতা যতটুকু উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে তাঁর আকাঙ্ক্ষা যে তার চেয়ে বেশি একথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। জাতিকে উদ্ধার করে জগতের সব তথাকথিত দুর্বল জাতিকেই অত্যাচার ও শোষণ থেকে তিনি মুক্তি দিতে চান। তবে এ মুহূর্তে পূর্ণ স্বাধীনতার যে একটা অপকৃষ্ট আদর্শ খাড়া করে চাওয়া হচ্ছে সে প্রস্তাবে তিনি রাজি নন। খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা পাবার জন্য স্বাধীনতার প্রস্তাবের চেয়ে ভারতকে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চান।[২০] গান্ধিজির এই প্রস্তাবকে সামনে রেখে *দৈনিক বসুমতী* জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে—

> ভারতবাসী যে সময় যেরূপ ভাবে কাজ করিতে সমর্থ হইবে, স্বরাজের অর্থও সে সময় সেই অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে। ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিলে প্রত্যেক জাতিই ঐরূপ করিবে।[২১]

রাজনৈতিক কার্যাবলিই নয়, গান্ধিজি সম্পর্কিত নানা খবরের প্রতিও *দৈনিক বসুমতী*-র ঝোঁক ছিল। দেশ-বিদেশে ভ্রমণ কথা, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি তথ্যও কখনও কখনও পরিবেশিত হয়েছে যত্নের সঙ্গে। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি খবরে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়—

> উড়িষ্যা প্রদেশের গঞ্জাম জিলার খদ্দর প্রচার সম্পর্কে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে গত শুক্রবার মহাত্মাজীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেজন্য তিনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভের জন্য বরাবর বোলগড়ে গমন করিয়াছেন। রক্তের চাপ অধিক হওয়াতে আশঙ্কার কারণ হইয়াছে।[২২]

সমকালে গান্ধিজির স্বদেশী আদর্শ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে পণ্য সামগ্রীর বিজ্ঞাপনেও গান্ধিজির নাম বারবার করে উঠে আসত। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন একটি নুন কোম্পানির বিজ্ঞাপনে *দৈনিক বসুমতী* যে বক্তব্য পরিবেশন করে তা সত্যিই অনবদ্য।[২৩]

গান্ধিজির মতো সুভাষচন্দ্রের নানা কার্যকলাপও *দৈনিক বসুমতী* নিয়মিত প্রকাশ করেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলে পত্রিকাটি উল্লসিত হয়ে লেখে—

> এবার শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুভাষচন্দ্র যে, বিনা বিচারে বন্দী হইয়াছিলেন—তিনি যে দেশপ্রেমের জন্য দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, ইহা তাহারই পুরস্কার। তিনি কংগ্রেসকে বঙ্গদেশে আবার শক্তিসম্পন্ন করুন—ইহাই আমাদের কামনা।[২৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং সামরিক অভিযানে লিপ্ত হন। এই অভিযান প্রথম দিকে অনেকটা সফল হলেও, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। যুদ্ধে জার্মানি সহ ফ্যাসি শক্তির পরাজয় ঘটলে ফৌজের সেনারা ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরপর ফৌজের সেনাদের বিচার শুরু হলে বিনাশর্তে তাদের মুক্তির দাবিতে বাংলা সহ সারা ভারতে আন্দোলন শুরু হয়। জাতীয় বাহিনীর ঐতিহাসিক বিচার থেকে শুরু করে গণ-বিক্ষোভ ও তার প্রতিক্রিয়ার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে *দৈনিক বসুমতী*তে স্থান পেয়েছে।[২৫]

তবে একথা ঠিক গান্ধি ও সুভাষচন্দ্রের মতপার্থক্যগুলিও *দৈনিক বসুমতী* প্রকাশ করেছে। কংগ্রেসের রাজনীতিতে বরাবরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল। সে ক্ষেত্রে *আনন্দবাজার* যেভাবে সুভাষচন্দ্রের পক্ষ নেয়, *দৈনিক বসুমতী* সেভাবে পারেনি। *অমৃতবাজার* ছিল গান্ধিবাদীদের পৃষ্ঠপোষক। *যুগান্তর* আবার বিপ্লববাদের প্রতি অনুগত। *দৈনিক বসুমতী* সেক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর—একটার পর একটা দুর্যোগ এবং গণ-আন্দোলনের আঘাত দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে বিরাট এক পরিবর্তনের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। সংবাদপত্রের প্রচার বাড়ে। দেশের এই সংকটে জনসাধারণের বিক্ষোভ ও বঞ্চনাকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে রূপান্তরিত করার জন্য সব জায়গায় রাজনৈতিক কর্মীরা সংঘবদ্ধভাবে যে চেষ্টা করেছিলেন তার পাশে এসে দাঁড়ায় বাংলার সংবাদপত্রের একটা বিরাট অংশ। *দৈনিক বসুমতী* এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫—অতি দ্রুত দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদল হতে থাকে। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণের পর জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থারের কাছে জাপানের আত্মসমর্পণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। কলকাতার রাজপথে ছাত্র-যুব শ্রমিক-মধ্যবিত্তদের মহামিছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধাদের মুক্তির দাবিতে উচ্চারিত স্লোগান, সারা ভারত ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের পক্ষে মিছিলের স্বর *দৈনিক বসুমতী*-তেও ধ্বনিত হয়।

সাধারণ মানুষের সামনে ভারতের স্বাধীনতাই ছিল আন্দোলনের প্রধান বিষয়। যুদ্ধ-পরবর্তী গ্রেট ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে টোরি দলের ভরাডুবি হয়। লেবার পার্টির নেতা ক্লিমেন্ট এটলি সরকার গঠন করে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশন পাঠানো হয় ভারতে। শুরু হয়ে

যায় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে দর কষাকষি। মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান দাবি করেন মহম্মদ আলি জিন্না। হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি—এই তত্ত্ব খাড়া করেন তিনি। এদিকে বাংলায় তখন চলছে মুসলিম লিগের মন্ত্রীসভা। কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেদিন বেতারে প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী অভিহিত হতেন এ নামে) সোহরাওয়ার্দি একটি ভাষণ দেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পটভূমি ব্যাখ্যা করে। বক্তৃতাটি ছিল সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক। এই ভাষণের নিন্দা করে জুতসই শিরোনামে *যুগান্তর* লিখল 'হত্যাকারীর কণ্ঠস্বর'। কলকাতার দাঙ্গাকে ব্রিটিশ পরিচালিত *স্টেটসম্যান* নাম দেয় 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। এই সাম্প্রদায়িক হানায় শুধু নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুই হয় না, সত্যাসত্য বিচার না করে জনরব ও গুজবের ডানায় ভর করে পারস্পরিক হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে মানুষ। এ সময় সংবাদপত্রের দায়িত্বও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কলকাতায় সেসময় ব্রিটিশ পরিচালিত *স্টেটসম্যান* ও *ক্যাপিটাল* পত্রিকা ইংরেজি, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় সংবাদপত্রের শিবির-বিভাজন ছিল। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বলে পরিচিত *আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* প্রভৃতি খবরের কাগজ ছিল কংগ্রেসের সমর্থক। এদের পাশাপাশি ছিল *স্বরাজ, কৃষক, ভারত, মাতৃভূমি* প্রভৃতি আরও কয়েকটি পত্রিকা যারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতের সহযাত্রী। কলকাতায় তখন মুসলিম লিগের নীতির সমর্থক পত্রিকা ছিল *ইত্তেহাদ, আজাদ, মর্নিং নিউজ, স্টার অফ ইন্ডিয়া* প্রভৃতি। কলকাতার বণিক সমাজেও হিন্দু পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের পাশাপাশি মুসলিম পুঁজিপতিরা ছিলেন। ফজলুল হকের সমর্থক পত্রিকা ছিল *নবযুগ*। নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দির সমর্থক ছিল *ইত্তেহাদ, স্টার অফ ইন্ডিয়া*। *আজাদ* ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো, তার সম্পাদক ছিলেন মউলানা আক্রাম খাঁ।

কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানিকে কেন্দ্র করে পত্রিকাগুলিতে যেসব সংবাদ ছাপা হত তার সত্যতা যাচাইয়ের কোনো উপায় ছিল না। ফলে উভয়পক্ষের সংবাদপত্রই ছিল অতিরঞ্জিত সংবাদে পূর্ণ। তার প্রতিক্রিয়ায় জনমানসে আতঙ্ক, ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির জন্য বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য তা কলুষিত হয়। এই পটভূমিতে *যুগান্তর, আনন্দবাজার* সহ *দৈনিক বসুমতী* দায়িত্বের সঙ্গে খবর ছাপতে পেরেছিল।

এর মধ্যে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি দেশভাগ হয়। ভারতবর্ষকে দু-টুকরো করে গঠিত হয় স্বাধীন ভারত এবং স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান। এতদিন সংবাদপত্রের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। সাংবাদিকতা ছিল দেশসেবারই অঙ্গ। স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতার পর সংবাদপত্রের গুরুত্বও যায় বেড়ে।

দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং বহু মুসলমান বাস্তুচ্যুত হয়ে ওপার বাংলায় যেতে বাধ্য হয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলতার সে এক চরম দৃষ্টান্ত। ১৯৪৮-এর মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর ঢল নামে। এর পরপরই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দু-বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে ঠাঁই নেয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান নেতৃত্ব এর তীব্র সমালোচনা করে। ঘটনার নিন্দা করে একটি পত্রিকা লেখেন —

> এখনই যদি উদ্বাস্তু আগমন রোধ না হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আমরা পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম ভ্রাতৃবর্গের কাছে আবেদন জানাচ্ছি সহানুভূতির সাথে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাতে হিন্দুরা সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে এবং তাদের সম্পদ ও সম্মান সম্পর্কে নিরাপত্তা বোধ করে। এটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যও প্রয়োজন।[২৬]

বিবৃতিটির শেষে যে আশঙ্কা দেখা যায় তা অমূলক নয়। বাস্তবিকই উদ্বাস্তুর ঢল সামলাতে সরকারকে অনেক বেগ পেতে হয়।

যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, স্বাধীনতা, দৈনিক বসুমতী-র মতো পত্রিকা এ নিয়ে সরব হয়েছে। সরকারের পুনর্বাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন পরিকল্পনা বিষয়ে সংবাদ যেমন এসময় *দৈনিক বসুমতী* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে তেমনি উদ্বাস্তুদের দাবি-দাওয়াকে সবার সামনে নিয়ে এসেছে। অবস্থা পর্যালোচনা করে পত্রিকাটি লেখে—

> আমরা এমন একটা সমাজে বাস করি, যেখানে স্বাভাবিক অবস্থাতেই কিছু সংখ্যক মানুষ অপ্রয়োজনীয় ও উদ্বৃত্ত বিবেচিত হয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই এ সমাজের একটা বিশাল অংশের জন্য অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয় না। সেখানে পঁচিশ

> ত্রিশ লাখ লোকের বাড়তি চাপ নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের সমস্যা। সরকারী দুর্নীতি এবং অপদার্থতা এবং বেসরকারী স্বার্থকেন্দ্রিকতা যদি সে সমস্যাকে অধিকতর জটিল করে তোলে, সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়ায় তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কিন্তু বিস্মিত ও বিষণ্ণ হই তখন, যখন ভাবি, কি হতে পারত, আর কি হল। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার দুইপারের বহু পরিত্যক্ত অঞ্চলে পোড়ো বাড়ির সাপের বাসা ভেঙ্গেছে, ডোবা-জঙ্গলে ভূত-প্রেতের ও মশার আড্ডা তাড়িয়েছে, কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ পূর্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে অঞ্চলে মানুষের বাস বিরল হতে হতে প্রায় শূন্য হয়ে এসেছিল, সেখানে উদ্বাস্তুরা নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। উৎসাহ, সহানুভূতি ও উপযুক্ত সাহায্য পেলে তারা এইসব অঞ্চলকে সোনার পুরীতে পরিণত করতে পারত।[২৭]

উদ্বাস্তু সমস্যার পাশাপাশি পঞ্চাশের দশকে কংগ্রেসের খাদ্যনীতি দেশের মানুষের সামনে অনাহার অনটনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে সর্বত্র খাদ্যের দাবিতে মিছিল বেরোতে থাকে। মার্কিন দেশ থেকে পি এল ৪৮০ কার্যসূচিতে পাঠানো নিকৃষ্ট শ্রেণির গম আর মাইলো ক্ষুধার্তদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৯৫৯-এ বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ডাকে কলকাতায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভুখা মিছিল এসে জড়ো হয়। *দৈনিক বসুমতী* লেখে—

> আর কোনো উপায় নেই, তাই এই সংগ্রাম। আমাদের রাজ্যে খাদ্যশস্যের অভাব নেই, তবুও তিরিশ থেকে তেত্রিশ টাকা মণ দরে গ্রাম ও শহরের মানুষকে চাল কিনতে হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে রেশন সরবরাহ প্রায় বন্ধ। দুর্গত ও ঘাটতি এলাকায় খাদ্য নেই। রিলিফের কাজ নেই। দুর্গত অঞ্চলের মানুষ অনাহারে মরছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজে ঘোরতর সংকট দেখা দিয়েছে। কাজ নেই, ঘরে টাকা নেই। খাদ্যের দাম বেড়েই চলেছে। গ্রাম ও শহরের মানুষ, কৃষক ও শ্রমিক, উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ চরম খাদ্য সঙ্কটে জর্জরিত।[২৮]

কিন্তু এই মিছিলের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ ও গুলিবর্ষণ করলে রাজধানী শহরে প্রায় আশি জন মারা যায়। এই নিন্দনীয় ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে সেদিন যেসব পত্র-পত্রিকা সরব হয়েছিল, *দৈনিক বসুমতী*ও তাদের দলে ছিল। এ সময় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে *যুগান্তর*-এ একের পর এক সম্পাদকীয় লিখে যান। সেই লেখাগুলি জনমানসেও ঝড় তুলেছিল। এর পরপরই বিবেকানন্দের সঙ্গে *যুগান্তর* মালিক গোষ্ঠীর বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধের সূত্রপাত ভারত-চিন যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি চিঠি প্রকাশকে কেন্দ্র করে। ১৯৬২-র ১৬ মে *যুগান্তর*-এ প্রকাশিত চিঠিটিতে এমন কিছু কথা ছিল যা ভারতের বিপক্ষে ও চিনের পক্ষে যায়। প্রকাশের সময় এ নিয়ে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। পরিস্থিতি বদলে যায় ঐ চিঠিটি উদ্ধৃত করে চিনের একটি প্রচার পুস্তিকা যখন যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতবাসীর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে বলে দাবি করে। সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এরকম একটি চিঠি প্রকাশের জন্য যারা দায়ী তাদের সম্পর্কে *যুগান্তর* কী ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান। প্রয়োজনে সরকারও যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে সেই ইঙ্গিতও ছিল সেখানে। এরপর বিবেকানন্দের সঙ্গে *যুগান্তর*-এর নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বছরের শেষ দিকে *যুগান্তর* ত্যাগ করে তিনি *দৈনিক বসুমতী*-তে যোগ দেন। তিনি যোগ দেওয়ার ফলে এই পত্রিকায় ভোল পালটে যায়। রাতারাতি বেড়ে যায় পত্রিকার প্রচার সংখ্যা। আমরা তার কথায় আসব। কিন্তু তার আগে সূচনালগ্ন থেকে যে সমস্ত মানুষজনের প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন ধরে *দৈনিক বসুমতী* নিয়মিত প্রচারিত হয়েছে তাঁদের ভূমিকাও স্মরণ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই আমরা বলেছি *দৈনিক বসুমতী*র প্রথম সম্পাদক ছিলেন শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্গানাথ ঘোষাল ছিলেন বার্তা সম্পাদক। বছর দুই পর সাপ্তাহিক ও দৈনিক দুটি পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পরবর্তীকালে সম্পাদকদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নাম পাওয়া যায়। গোপালচন্দ্র নিয়োগী সম্পাদক হিসাবে *বসুমতী*-তে অনেকদিন কাজ করেছেন।

১৯১৯-এ *বসুমতী*র কর্ণধার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে পুত্র সতীশচন্দ্রের উপর প্রতিষ্ঠানের ভার সামলানোর দায়িত্ব এসে পড়ে। তিনি *দৈনিক বসুমতী*-র সম্পাদক না হলেও পত্রিকাটির প্রচার ও প্রসার কীভাবে করা যায়

তা নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করতেন। ছাপার কাজে গতি আনার জন্য ১৯২১-এ সতীশচন্দ্র জার্মানি থেকে রোটারি মেসিন আনেন। দ্রুততম পদ্ধতিতে আধুনিকতম সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্য পূর্ণ করতে রয়টার-এর সদস্য হন। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে *দৈনিক বসুমতী*-র চাহিদা আরও বেড়ে যায়। প্রথমে মাত্র বারোশো কপি দৈনিক বসুমতী, উনিশশো কপি *সাপ্তাহিক বসুমতী* ছাপা হত। এসময় সতীশচন্দ্র আঠারোশো পত্রিকা ছাপেন আর চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণের দিন সেই সংখ্যাটা বেড়ে প্রায় চারগুণ হয়। ওইদিন *দৈনিক বসুমতী* ছাপা হয় পঁয়ষট্টি হাজার। এ পরিমাণ সার্কুলেশন সে সময়ে ছিল অভাবনীয়।

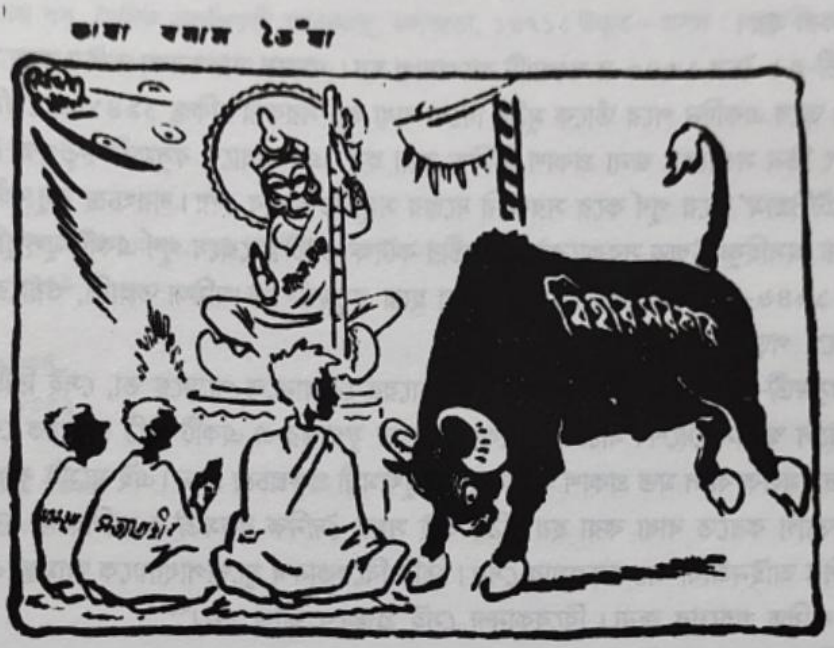

দৈনিক বসুমতী-তে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গচিত্র।

জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য, সরকার বিরোধী মত প্রকাশের জন্য, *দৈনিক বসুমতী* বহুবার রাজরোষে পড়েছে। ১৯২০-তে উগ্রপন্থী হিসাবে *বসুমতী*-কে চিহ্নিত করা হয়। ৪.৬.১৯২৬-এ সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর দণ্ডিত হন। তবে হাইকোর্টে আপিলের পর মুক্তি পেয়ে যান। ২৬.৬.১৯৩০, ২.৭.১৯৩০, ১৫.৭.১৯৩০, ২৭.৭.১৯৩০, ১২.১.১৯৩১, ২০.১.১৯৩১, ২.২.১৯৩১, ১৯.২.১৯৩১, ৩.৩.১৯৩১-এ সতর্ক করে দেওয়া হয় পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে। উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট বের করার জন্য পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২৯.৬.১৯৩২-এ পত্রিকার প্রকাশক ও বসুমতী প্রেসের কিপারের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা করে জামানত দাবি করা হয়। জামানত জমাও পড়ে। ২.১.১৯৩২, ৯.১.১৯৩২, ১১.১.১৯৩২, ১০.২.১৯৩২, ১.৪.১৯৩২, ১২.৫.১৯৩২-এ পত্রিকাকে পুনরায় সতর্ক করা হয়।

৯.১২.১৯৩২-এ প্রকাশক ও মুদ্রাকরের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। প্রকাশক ও প্রেসের কিপারের কাছ থেকে নতুন করে তিন হাজার টাকা করে জামানত দাবি করা হয়। হাইকোর্টে আপিল করা হলে রাজ্য সরকারের আদেশ খারিজ হয়ে যায়। ১৩.৬.১৯৩৩-এ আপত্তিকর শিরোনামের জন্য, ১৮.৯.১৯৩৩-এ আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য ২৮.১২.১৯৩৩-এ আপত্তিকর শিরোনামের জন্য পত্রিকাটিকে সরকার পুনরায় সতর্ক করে দেন। ১৯৩৪-এর ২ জানুয়ারি পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। তা ছাড়া ৩.১.১৯৩৪-এ আপত্তিকর শিরোনামের জন্য, ৬.২.১৯৩৪-এ স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশের জন্য ৭.৪.১৯৩৪, ১৬.৪.১৯৩৪, ২৬.৬.১৯৩৪-এ আপত্তিকর শিরোনামের জন্য সতর্ক করা হয়। ২১.৪.১৯৩৪-এ লয়ালপুরে গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ৪.১২.১৯৩৪-এ গফুর খাঁ সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ১৭.৫.১৯৩৫-এ নোয়াখালির ঘটনা ও লেবংয়ে জুলুম সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশের জন্য সতর্ক করা হয়।

১৪.১০.১৯৩৫-এ প্রকাশক ও প্রেসের কিপারের পাঁচশো টাকা জামানত জব্দ হয়। এবং প্রত্যেককে নতুন করে তিন হাজার টাকা জামানত দিতে হয়। এর বিরুদ্ধে আবেদন করা হলে প্রেস আইনের ২৩ ধারা বলে হাইকোর্ট তা বাতিল করে দেয়। ১১.৪.১৯৩৪-এ 'বাংলা কাব্য' নামক নিবন্ধের জন্য পত্রিকাকে সতর্ক করা হয়। ২৮.৭.৩৭-এ জামানতের কিছু অংশ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১০.৪.১৯৩৭-এ বর্ধিত হারে সাত হাজার পাঁচশো টাকার জামানত জমা দিতে হয় প্রকাশক ও কিপার প্রত্যেককে। এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন জানানো হলে সরকারি আদেশ বাতিল হয়ে যায়। এক হাজার চারশো টাকা ফেরত দেওয়া হয়। ১৬.৭.১৯৪০-এ 'ব্রিটেন ও দুর প্রাচ্য' এবং ২৫.৯.১৯৪০-এ সিভিক গার্ড সংক্রান্ত নিবন্ধের জন্য বসুমতীকে সতর্ক করা হয়।

দৈনিক বসুমতী-র ৯ চৈত্র ১৩৪০-র সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয়। এসময় ভারতরক্ষা আইন বলে সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদকে গ্রেপ্তারও করা হয়। তবে একদিন পরে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। কিন্তু ১৯৪১-এ *দৈনিক বসুমতী*-র পুনঃপ্রকাশ বিক্রি ও বন্টন এবং তিন সপ্তাহের জন্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। এর জবাবে *বসুমতী কর্তৃপক্ষ দৈনিক বসুমতীর* সাময়িক শূন্যস্থান '*বসুমতী টেলিগ্রাম*' দিয়ে পূর্ণ করে সরকারি দম্ভের সমুচিত জবাব দেয়। শরৎচন্দ্র বসু বঙ্গীয় আইনসভায় ২ এপ্রিল ১৯৪১ সমালোচনায় অসহিষ্ণু উন্মত্ত সরকারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষে পূর্ণ একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এখানেই শেষ নয়, ১৯৪৬-এও সরকারি রোষের শিকার হয়ে *বসুমতী*-কে অফিস তল্লাশি, ওয়ারেন্ট বিনা রক্ষীদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি নানা দুর্ভোগে পড়তে হয়।

শুধু *দৈনিক বসুমতী*-ই নয় নানা পত্র-পত্রিকাই সরকারের রোষানলে পড়েছে তা, সেই ব্রিটিশ শাসনকালে হোক বা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে স্বাধীন দেশে। ষাটের দশকের শুরুতে *যুগান্তর*-এ একটি চিঠি ছাপাকে কেন্দ্র করে তুমুল হট্টগোল বাধে। চিঠিটি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বলে মত প্রকাশ করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই মর্মেই *যুগান্তর* সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। ঠিক এই সময় *দৈনিক বসুমতী*-র মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। পত্রিকাটির স্বত্ব কিনে নেন বিশিষ্ট আইনজীবী অশোককুমার সেন। তিনি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানান *দৈনিক বসুমতী*-র প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। বিবেকানন্দ সেই প্রস্তাবে রাজি হন।[২৯]

দৈনিক বসুমতী হাতে পেয়ে বিবেকানন্দ কামান দাগাতে শুরু করেন কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি ও জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে। অশোককুমার সেন কংগ্রেসের এমপি হলেও তিনি অতুল্য ঘোষ গোষ্ঠীর বিরোধী ছিলেন। সুতরাং *যুগান্তর* থেকে চলে এলেও বিবেকানন্দের কলম থামেনি। নতুন উদ্যমে তিনি *বসুমতী* পত্রিকাকে নিভন্ত অবস্থা থেকে রীতিমতো অগ্নিশিখায় পরিণত করলেন খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। তিনি যখন *বসুমতী*-তে যোগ দেন তখন তার প্রচারসংখ্যা ছিল দশ হাজারের নীচে। খাদ্য আন্দোলনের সংবাদ এবং বিবেকানন্দের সম্পাদকীয় প্রকাশের ফলে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যে লাখ ছাড়িয়ে যায়। 'কাঁচকলা আর আলুসিদ্ধ', 'ফ্যাসিস্ট নৃত্য ও বৈষ্ণব কীর্ত্তন', 'মৌন মিছিল, না মৌন ধিক্কার', 'ফার্স্ট ক্লাশ মুখ্যমন্ত্রী', 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' ইত্যাদি সম্পাদকীয় রচনার শ্লেষ ও বিদ্রূপ পাঠকদের মনে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভকেই সেদিন ভাষা দিয়েছিল।[৩০] তার পরিণতিতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের মুখোমুখি হয়ে অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেন গোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষেই জনতার রোষের শিকার হন। পশ্চিমবঙ্গে একটা রাজনৈতিক ভূমিকম্প হয়ে যায়। সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পতন ও কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্টের উত্থান ঘটে। এই ঐতিহাসিক পালাবদলের নেপথ্যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও *দৈনিক বসুমতী*-র কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

তথ্যসূত্র :

১. প্রবোধকুমার সান্যালের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় পত্রিকাটি বের করার সময় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আহিরিটোলায় শ্যামাচরণ ভাদুড়ীর কাছ থেকে একহাজার টাকা ধার করেন। উভয়ের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। *বনস্পতির বৈঠক*, প্রবোধকুমার সান্যাল, কলকাতা, ১৩৮০

২. শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও হরিপদ অধিকারী ছিলেন *সাপ্তাহিক বসুমতীর* সম্পাদক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে উপেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় শশিভূষণকে *দৈনিক বসুমতী* প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শশিভূষণ তাতে খুব উৎসাহ দেখাননি, শেষে উপেন্দ্রনাথের কিশোরপুত্র সতীশচন্দ্রের আগ্রহে শশিভূষণ পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে রাজি হন। এক্ষেত্রে দুর্গাদাস ঘোষাল হন তাঁর সহায়ক।

প্রসঙ্গ : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ২০০৫। *Report on Native papers* (1914-15)

৩. প্রবোধকুমার সান্যাল জানিয়েছেন, *দৈনিক বসুমতী* ছড়ালে জনা আষ্টেক লোক তার উপর বসতে পারত। *বনস্পতির বৈঠক*, প্রাগুক্ত

৪. 'শুভেচ্ছা', মনোজ বসু, *দৈনিক সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, কলকাতা, ১৩৭১। উদ্ধৃত—প্রসঙ্গ : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, প্রাগুক্ত

৫. *Report on Native papers* 1.10.1914

৬. ওই, 1.3.1914

৭. ওই, 22.10.1914

৮. ওই, 12.12.1914

৯. *দৈনিক বসুমতী* ৩০ চৈত্র ১৩৩১, ২৫ কার্তিক ১৩৩৪, ১৯.১০.১৯২৭

১০. ওই, ৩০ চৈত্র ১৩৩১

১১. ওই

১২. ওই, ১৯.১০.১৯৩৪

১৩. ওই, ৩০ চৈত্র ১৩৩১

১৪. ওই

১৫. ওই, ২৫ কার্তিক ১৩৩৪

১৬. ওই, ১৯.১০.১৯৩৪

১৭. ওই, ৬ মাঘ ১৩৩৪

১৮. ওই

১৯. ওই

২০. ওই, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

২১. ওই

২২. ওই, ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

২৩. ওই

২৪. ওই

২৫. ওই ২৫ কার্তিক ১৩৫০, ১৯ কার্তিক ১৩৫২

২৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৮

২৭. *দৈনিক বসুমতী*, ৩.১২.১৯৫৩

২৮. ওই ১৯ পৌষ, ১৩৬০

২৯. *বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়*, কৃষ্ণ ধর কলকাতা ২০০৩

৩০. ওই